একক ১ ❑ সাম্য ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

১.১ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ ও সময়-দেশ-কাল
১.২ গ্রন্থ-প্রস্তাবনা ও গ্রন্থ-পরিচিতি
১.৩ রচনার প্রেক্ষাপট
১.৪ 'সাম্য' : নিবিড় পাঠ
১.৫ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ
১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যভাবনার মূলকথা

১.১ ❑ বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজগৎ ও সময়-দেশ-কাল

বাংলা সাহিত্যের সচেতন পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের "সাম্য" রচনাটি আজও একটি উদ্যত জিজ্ঞাসা হয়েই আছে। কেন-ই বা লিখতে গেলেন? আবার কেন-ই বা লিখেও পরবর্তী মুদ্রণের সময় প্রত্যাহার করে নিলেন? অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত, যোগেশচন্দ্র বাগল, প্রমথনাথ বিশীর মতো সমালোচকেরা এর উত্তর যদিও দিয়েছেন, ভাষাগত হেরফের থাকলেও তাঁদের মূল বক্তব্য সাম্যগত তত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্রের আগের বিশ্বাস আর ছিলনা, 'গীতা, মহাভারত ও কৃষ্ণের প্রভাবে' পূর্বের প্রবন্ধটি তাই অবাঞ্ছিত মনে হয়েছে। একপেশে সরলীকৃত এই ব্যাখ্যার পাশাপাশি আর এক ধরণের স্থূল অগভীর আলোচনা আছে, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্রকে ভীরু-পলাতক রূপে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ফলত প্রশ্নটি আজও সম্যক্‌রূপে আলোচিত হয়নি—অথচ প্রশ্নটি সরল নয় জটিল,—বহুমাত্রিক; তত্ত্বগত কারণে 'সাম্য'কে বঙ্কিমচন্দ্র যদি পুনর্মুদ্রণের অযোগ্য বলেই মনে করে থাকেন, তবে মূল সাম্য গ্রন্থভুক্ত 'বঙ্গদেশের কৃষক' বিস্তারিতভাবে পরবর্তীকালে প্রকাশ করলেন কেন? সমাজস্থ অসাম্যজনিত দুঃখকষ্ট যন্ত্রণার উদ্‌গার কেন করলেন কমলাকান্তের 'বিড়াল'-এ, 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'-তে হাল্কা হাসিমস্করা দিয়েও সে যন্ত্রণার টুঁটি টিপে ধরতে পারলেন না কেন? সমাজবিজ্ঞানীর বিশ্লেষণ নিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যায়, চলতিকালে ব্যক্তিকে বহুধা-ব্যক্তিত্ব নিয়েই চলতে হয় (multipersonality), চিন্তার জগতের সঙ্গে ব্যবহারিক জীবনের ছোটবড় দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে, কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি হলে সেই দ্বন্দ্বই প্রকট হয়ে ওঠে, প্রতিভাসিত হয় আনুষঙ্গিক ক্রিয়াকলাপে। ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে 'সাম্য' পুস্তকাকারে প্রকাশিত করেও পরবর্তীকালে প্রত্যাহার করে নেয়ার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্র কী তেমন কোন নিজস্ব সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছিলেন? প্রশ্নটির আদ্যন্ত আলোচনাই সমীচীন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' রচনা করতে গেলেন কেন? এক কথায় এর উত্তরে বলা যায়, তৎকালীন বাঙালী বুদ্ধিজীবীদের মনন-চিন্তনের পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা, দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতই বঙ্কিমচন্দ্রকে বাধ্য করেছিল এই জাতীয় রচনায়,—"সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। জল উপরিস্থ বায়ু এবং নিম্নস্থ পৃথিবীর অবস্থানুসারে, কতকগুলি অসংখ্য নিয়মের অধীন হইয়া, কোথাও বাষ্প, কোথাও বৃষ্টিবিন্দু, কোথাও শিশির, কোথাও হিমকণা বা বরফ, কোথাও কুজ্‌ঝটিকারূপে পরিণত হয়। তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়।" (বিদ্যাপতি ও জয়দেব) তৎকালীন বাংলার সারস্বত-সামাজিক পরিমণ্ডলই ছিল সাম্যচিন্তায় পরিপূর্ণ, এ বিষয়ে পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন ডিরোজিও এবং ডিরোজিও শিষ্যরাই; নীলচাষের পটভূমিকায় নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করে, সরকারী চাকরিতে ভারতীয় বিনিয়োগের দাবি তুলে, সরকারের বিচারপদ্ধতির

সমালোচনা করে সাম্যভিত্তিক মানবতাবোধের প্রতিই তাঁরা তর্জনী নির্দেশ করেছিলেন,—একটি একটি অগ্নিক্ষরা লেখা লিখে চলেছিলেন 'ইন্ডিয়া গেজেট', 'দি কুইন', 'দি পার্থেনন', 'হিন্দু পাওনিয়ার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায়—'Freedom', 'Colonisation of India,' 'India under Foreigners'। দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের ভূমিকা তো রীতিমত হয়ে ওঠে চাঞ্চল্যকর, সোচ্চারে লিখে চলেন,—সাম্য মানুষের জন্মগত অধিকার, জন্মকালে এক মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের কোন পার্থক্যই থাকে না,—পৃথকীকরণ করা হয় পরবর্তী সময়ে স্বার্থে, সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনে; রামগোপাল ঘোষও 'কালা আইন' আন্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে হৃৎকম্প ধরিয়ে দেন কোম্পানীর কর্মকর্তাদের। রাজনৈতিক চিন্তায় ও সমাজ সংস্কারের পরিকল্পনায় সাম্যনির্ভর বিভিন্ন খবরাখবর নিয়ত নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করে চলে,—দ্বিতীয়-তৃতীয় সংস্কার আইন ইংলন্ডে লিপিবদ্ধ হচ্ছে, 'Third Republic' প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে ফ্রান্সে, আমেরিকার শাসনতন্ত্রও বেশী করে গণতন্ত্রমুখী হচ্ছে;—দশদিক থেকে ঝড়ো বাতাস শুধু উড়িয়ে আনতে থাকে মানুষের অধিকার স্বীকৃতির সংবাদ (History of Political Thought Vol. I : Biwan Behari Majumder, P. 116-117)—'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার মত পত্রিকাতেও পূর্ববঙ্গের বিপ্লবী নেতা টিপুপাগলের সাম্যদর্শী মতবাদের প্রসঙ্গে এসে পড়ে লুই ব্ল্যাঙ্কের তুলনা;—লুই ব্ল্যাঙ্ক তো 'Young Bengal'-এর কাছে স্বপ্ননায়ক হয়ে ওঠেন,—তিনি সোচ্চারে মানুষের অধিকারের কথা বলছেন, রাজতন্ত্র ভেঙে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নেতৃত্ব নিয়ে চলেছেন, তখন কলকাতার শিক্ষিত যুবকদের হাতে হাতে ঘুরছে পতাকার মত তাঁর গ্রন্থ 'Letters on England' (1866), 'Observation on Economic, Political and Social Life in England' (1867), অনিবার্যভাবেই ১৮৭০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিজ্ঞানের (Political Economy) সাম্মানিক পরীক্ষায় (Honour Examination) প্রশ্ন করা হচ্ছে "What is the aim of Communism? Describe the Schemes profounded by Fourier and St. Simon respectively". এই রকম পরিবেশ-পারিপার্শ্বিকতায় ঊনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম বুদ্ধিজীবী বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগত সাম্যচিন্তায় যদি না উদ্রিক্ত হতো, তাহলেই বিস্মিত হতে হতো।

সাম্যরচনার পশ্চাৎপর্বে বহিরঙ্গের এই তাগিদটা ছাড়াও কার্যকর হয়েছিল অন্তর্গত একটি দাহ,—দেশকে আবিষ্কার করার প্রয়াস, দেশের সঙ্গে নিজের অভিজ্ঞানটি খুঁজে নেবার প্রাণগত উৎকণ্ঠা,—'এই জীবন লইয়া কি করিব?' এই উৎকণ্ঠার কথা বলতে গেলে অবশ্যই সংযুক্ত করে নিতে হয় আরো কিছু কৃতবিদ্য ব্যক্তিদের নাম, যাঁরা ইংরেজি সভ্যতা-সংস্কৃতির সংস্পর্শে জ্ঞানবিজ্ঞানের বিশ্বরূপ ও ন্যায়াদর্শের সর্বভূমিনতা দেখে আহ্লাদিত হয়েও কিছুদিনের অভিজ্ঞতার মধ্যে বুঝেছিলেন তথাকথিত এই সভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে দেশীয় অধিবাসীদের সুখদুঃখের, দারিদ্র্য দূরীকরণের কোন সম্পর্ক নেই; প্যারীচাঁদ মিত্র, অক্ষয়কুমার দত্ত, শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ বিদ্বজ্জনেরা চাষীর দুরবস্থা, খেতমজুর ও গ্রামবাসীদের দুঃসহ জীবনকথা প্রতিবেদনের মধ্যে দিয়ে সেই প্রশ্নকেই তুলে ধরলেন, শ্রমিকদের স্বার্থে অনুরূপ ভাবনা-চিন্তায় রচনা সমৃদ্ধ করে এগিয়ে এলেন শশিপদ ব্যানার্জী, কেশবচন্দ্র সেন, কৃষক সমাজের করুণজীবনের সার্থক চিত্র তুলে ধরলেন লালবিহারী দে, রমেশচন্দ্র দত্ত। চিন্তাভাবনায় এঁরা যে সবাই একস্থানে দাঁড়িয়ে ছিলেন তা নয়, তাহলেও সবাই মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলেন ইংরেজদের চলতি কর্মকান্ড এদেশের শিল্পায়নের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে চায়, কৃষককে করতে চায় তার জাতীয় ধনভাণ্ডার পূর্ণ করবার জন্য নিযুক্ত কৃষি-মজুর মাত্র। দক্ষিণারঞ্জন-রামগোপাল-রাধানাথ দে-র চেতনায় এই বোধ গুঞ্জন তুললেও, তা ছিল মূলত অধ্যয়ন-পঠন-পাঠনের হাওয়াতেই ভাসন্ত, এঁদের মত সংবেদনময়, দৃঢ়মূল জীবনচারিতায় আশ্লিষ্ট নয়,—তাই ওঁদের ক্ষেত্রে অনেকটাই ছিল প্রভাব, এঁদের ক্ষেত্রে দাহ। এই সময়বৃত্তের উল্লেখনীয় লেখাগুলি যথাক্রমে, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'The Zeminder and the Ryot' (1846), কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'The Ryot and the Zamindar (1859) সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'Bengal Ryot' (1864), লালবিহারী দের 'The History of a Bengal Raiyat' (1866)

এবং 'Bengal Peasant Life' or Govinda Samanta (1874) রমেশচন্দ্র দত্তের 'The Peasantry of Bengal (1874), ও 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকার (1874) বিভিন্ন সংখ্যাগুলি। ইংরেজদের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি অকলঙ্ক শ্রদ্ধা ও বৃটিশ রাজপুরুষদের ওপর অচঞ্চল নির্ভরশীলতা থাকা সত্ত্বেও দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা ও দুর্গতি এঁদের নিঃসন্দেহ ভাবিয়ে তুলেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছিল মধুসূদনীয় উচ্চাকঙ্ক্ষা ও স্বপ্নচারিতার মধ্য দিয়েই, রং আর রক্তের পরিচয় ভিন্ন রুচি-উদ্যম-নীতিজ্ঞান-মনীষা সব দিক দিয়েই খাঁটি ইংরেজ হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন। পিতা যাদবচন্দ্র ছিলেন তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির সংসারী লোক,—বুঝেছিলেন দেশীয় রাজারাজড়া আমীর ওমরাহদের দিন আর নেই, ইংরেজরাই এ দেশের ভবিষ্যৎ এবং ইংরেজ আচরিত সামাজিক আদর্শ ও চালচলন রীতিনীতিই আগামী দিনগুলিতে সামাজিক প্রতিপত্তিলাভের সহায়ক হবে,—অন্য ছেলেদের মত বঙ্কিমচন্দ্রকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষ করেছিলেন। তিনি যখন মেদিনীপুরে থাকতেন, ইংরেজ পরিবারদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়েই থাকতে চেষ্টা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্র বড় হয়ে উঠেছিলেন ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষা, ইংরেজদের প্রত্যক্ষ সঙ্গ-সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়েই। বড় হয়ে জীবিকার সূত্রে জীবনের বৃহত্তর পরিমণ্ডলে এসে দাঁড়াতেই তাঁর জীবনের দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে যায়। ইংরেজী শিক্ষা-সংস্কৃতি অনুধ্যানে যে দেশের পরিচয় পেয়েছিল, সেই দেশকে বাস্তবে কোথাও পেলেন না, দেশের সঙ্গে নিজের যোগসূত্রটিও খুঁজে পেলেন না,—নিজের মধ্যে অদ্ভুতকে নিঃসঙ্গতা বিচ্ছিন্নতা একাকীত্বের বোধ গড়ে উঠতে থাকলো,—'কমলাকান্ত'র 'একা'র মধ্যে সেই রুদ্ধ বেদনাই হাহাকার করে উঠল, নিজের আহার-নিদ্রা-মৈথুন-কর্তৃত্বদারি নিয়েই জীবনের পূর্ণতা নয়। শহর গড়ে উঠছে, জেল্লাজৌলুষ আনন্দস্ফূর্তি নিয়ে ইংরেজি শিক্ষিত বাবু ও তার পরিজনদের জীবন মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলেছে, বাহ্যসম্পদ (ভোগ্যপণ্য) সংগ্রহ প্রতিযোগিতায় ক্রমশ 'মিথ্যা-প্রবঞ্চনা উৎকোচ গ্রহণ জালজুয়োচুরির' সংখ্যা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে,—মুৎসদ্দি-ব্যাপারী-দেশীবিদেশী আমলা-দালাল আর নানান ধরনের উপস্বত্বভোগীদের সঙ্গে দেশের গরিবগুর্বো কৃষক-কারিগর শ্রেণীর ভেদরেখা ক্রমেই হচ্ছে স্পষ্ট তীক্ষ্ণ,—বঙ্কিমচন্দ্র এই ভয়াবহ শূন্যগর্ভতা কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না, চাপা বেদনায় কমলাকান্তের জবানীতে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন,—'দেখ কত বাণিজ্য বাড়িতেছে,—দেখ, কেমন রেলওয়েতে হিন্দুভূমি জালনিবদ্ধ হইয়া উঠিল—দেখিতেছ, টেলিগ্রাফ কেমন বস্তু। দেখিতেছে, কিন্তু কমলাকান্তের জিজ্ঞাসা এই যে,—তোমার রেলওয়ে টেলিগ্রাফে আমার কতটুকু মনের সুখ বাড়িবে? আমার এই হারান মন খুঁজিয়া আনিয়া দিতে পারিবে? ('আমার মন') কঙ্কালসার সর্বস্বান্ত রামধনপোদ-রামাকৈবর্ত-হাসিমশেখ-পরাণ মণ্ডলদের বাদ দিয়ে কোন ভবিষ্যৎ ভাবনাতেই নিরত থাকতে চান না, ধনসঞ্চয়ের কোন খতিয়ান মেনে নিয়ে তিনি বলতে চান না, দেশের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে,—ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়েন, "দেশের মঙ্গাল? দেশের মঙ্গাল, কাহার মঙ্গাল? তোমার আমার মঙ্গাল দেখিতেছি, কিন্তু তুমি আমি কি দেশ? তুমি আমি দেশের কয়জন? আর এই কৃষিজীবী কয়জন? তাহাদের ত্যাগ করিলে দেশে কয়জন থাকে? হিসাব করিলে তাহারাই দেশ।" তীব্র দাহ আর দ্বন্দ্ব, আবেগগাঢ় বেদনায় সমস্ত ধরনের অভিজ্ঞতা-নিরীক্ষা-অধ্যয়ন-অনুক্রম নিয়ে তিনি দেশ এবং সেই দেশের সঙ্গে নিজের আইডেনটিটি খুঁজে পাবার চেষ্টা করে চলেন, লিখিত হয় 'সাম্য'।

'সাম্য' প্রবন্ধটির মধ্যে যদিও 'কম্যুনিজম' ও 'ইন্টারন্যাশনাল' এই কথা দুটির উল্লেখ আছে, তথাপি মার্কস-এঙ্গেলস' এর মতবাদসমূহের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত হবার সুযোগই ছিলনা, কেন-না 'Das Capital'-এর সর্বপ্রথম ইংরেজি অনুবাদ হয় ১৮৮৭ সালে Samuel Moore ও Edward Aveling কর্তৃক এবং 'Communist Manifesto' ইংরেজীতে অনূদিত হয় Samuel Moore কর্তৃকই ১৮৮৮-এ। মেধাবী সর্ববিদ্যাবিশারদ বহুদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে এই সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। মূলত 'সাম্য'-এর মধ্যে

তিনি রুশো ছাড়া প্রুঁধো (১৮০৯-১৮৬৫), সেন্ট সাইমন (১৭৬০-১৮২৫), রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮), শার্ল কুরিয়র (১৭৭২-১৮৩৭), লুই ব্ল্যাঙ্ক (১৮১১-১৮৮২) প্রমুখের সাম্যবাদী চিন্তাচেতনার উল্লেখ করেছেন। যে সমাজের ধনবৃদ্ধি হয় শুধু ধনীর সমৃদ্ধির মধ্যে দিয়ে, সে সমাজ যে জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির ওপরেই বসে থাকে, বস্তুনিষ্ঠ পরিবেশসচেতন বঙ্কিমচন্দ্র একথা জানতেন বলেই সমকালীন এইসব চিন্তাবিদদের আত্মস্থ করেছিলেন। প্রুঁধো সম্পর্কে সমাজতন্ত্রীদের নানান অভিযোগ জেনে নিয়েও তো বলা যায়, তিনিই 'What is property' (১৮৪০) গ্রন্থে 'Property is theft' বলে সেই চাঞ্চল্যকর শ্লোগানটি তুলে এবং তার পরের বৎসরেই 'Warning to proprietors' লিখে ব্যঙ্গাবক্র ভর্ৎসনায় পশ্চিম ইউরোপকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। যুগোপযোগী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাচেতনার প্রসার ঘটিয়েছিলেন সেন্ট সাইমন, আজকের যুগে তাঁর গোটা কর্মকাণ্ড কৌতুককর হলেও, তখন এরই প্রভাবে ইংরেজ পুঁজিবাদী শ্রেণী নড়েচড়ে বসেছিল, জন স্টুয়ার্ট মিল ও টমাস কার্লাইল নতুন চিন্তার সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। শার্ল কুরিয়রও সেই সময়ের এক উল্লেখনীয় ব্যক্তিত্ব। সামাজিক অগ্রগতিতে শ্রমের অধিকার সর্বাগ্রে, বর্তমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় সেই শ্রম তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে বলেই চলতি রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে কুরিয়র বিরামহীনভাবে বিষোদ্‌গার করেছিলেন, আর রবার্ট ওয়েন তো ছিলেন এক চাঞ্চল্যকর জীবনেরই অধিকারী,—যিনি ধনীর সন্তান হয়ে ধনৈশ্বর্যের আবেষ্টনী ভেঙে মানুষের মঙ্গালের জন্যে আশ্রয় নিয়েছিলেন পাতার কুটিরে,—ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের 'Utopian Socialist' দের মধ্যে সর্বোত্তম,—এঙ্গেলস যাঁর সম্পর্কে ছিলেন সশ্রদ্ধ, "a man of almost sublime and childlike simplicity of character, and at the sametime one of the few born leaders of men."—বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যতন্ত্রী এইসব বিচিত্র চিন্তাচেতনার সঙ্গেই তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণাগুলি যাচিয়ে নিয়েছেন, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদী চিন্তার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না,—সে আলোচনার মধ্যে আসার তাই প্রশ্নও ওঠেনা।

১.২ গ্রন্থ-প্রস্তাবনা ও গ্রন্থ-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থের গুরু জানিয়েছেন—"অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' 'লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহারই উত্তর খুঁজিয়াছি।" ('ধর্মতত্ত্ব' একাদশ অধ্যায়, ঈশ্বরে ভক্তি) —গুরুর এই ভাষ্যকে বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনভাষ্য বলা যায়। আবার এই জীবনভাষ্যের মধ্যে যে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে আসে তা আসলে সমাজজিজ্ঞাসারই নামান্তর। জীবনের প্রতি পর্বে বিভিন্ন রচনার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সেই সমাজজিজ্ঞাসাকে তথা সত্যানুসন্ধানকে শিল্পরূপ দিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য 'সাম্য' গ্রন্থ রচনার উৎস মূলেও আছে এই সমাজজিজ্ঞাসা।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে 'সাম্য' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর আগে পত্রিকায় গ্রন্থটি বিচ্ছিন্নভাবে মুদ্রিত হয়েছিল। ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গাদর্শন' পত্রিকায় 'সাম্য' নামে একটি প্রকাশিত হয়। আষাঢ় সংখ্যায় ওই বছরেই বেরোয় 'সাম্য দ্বিতীয় সংখ্যা' এবং ১২৮২ বঙ্গাব্দে কার্তিক সংখ্যায় বেরোয় 'সাম্য তৃতীয় প্রস্তাব স্ত্রীজাতি'। উক্ত তিনটি প্রবন্ধের সঙ্গে ১২৭৯ বঙ্গাব্দে 'বঙ্গাদর্শন'-এ প্রকাশিত 'বঙ্গাদেশের কৃষক' প্রবন্ধটির কিছু অংশ সংযোজন করে পুস্তাকাকারে 'সাম্য' প্রকাশ করেন।

১.৩ গ্রন্থ-রচনার প্রেক্ষাপট

'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' গ্রন্থে শ্রীশচন্দ্র মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন—"বঙ্কিমবাবু বলিলেন, এক সময়ে মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল, এখন সেসব গিয়াছে।' নিজের লেখা প্রবন্ধের কথা উঠিলে বলিলেন, 'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।" আমরা এও জানি, বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য' আর না ছাপিয়ে 'বঙ্গাদেশের

কৃষক' প্রবন্ধটি কেবল তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করেন। ফলত একটি প্রশ্ন উঠতে পারে 'সাম্য' গ্রন্থটির পুনঃপাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

বঙ্কিমচন্দ্র সীতা-কৃষ্ণ-মহাভারত' ইত্যাদি গ্রন্থকে আকররূপে ধরে, অনুশীলনতত্ত্ব নামে একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন তার শেষ দিকের রচনায়। শেষের দিকের উপন্যাস—'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' কিংবা 'ধর্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণ চরিত্র' নামের প্রবন্ধগ্রন্থ-এর সাক্ষ্য বহন করে। বঙ্কিমচন্দ্র তখন যে দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন তখন সাম্য-এর ভাবনা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি। কিন্তু একজন শিল্পী ব্যক্তিত্বের পূর্ণপরিচয় যখন আমরা নিতে যাব তখন তাঁর প্রতিটি রচনাই আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনসম্পর্কিত অভিজ্ঞতা উপলব্ধির বিবর্তন রেখাটি চিনে নিতে এইজন্যই 'সাম্য' গ্রন্থটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে।

বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'সাম্য' রচনা করেছেন তখন কলকাতাকেন্দ্রিক বৌদ্ধিক পরিমণ্ডলে সাম্য চিন্তার ঢেউ উঠেছিল। ডিরোজিওর শিষ্যরা নীলকরসাহেবদের অত্যাচার, সরকারের বিচারপদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছিল। প্যারীচাঁদ মিত্রের The Zamindar and the Ryot (1846), কিশোরচাঁদ মিত্রের লেখা 'The Ryot and the Zamindar (1859), সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের Bengal Ryot (1864) ইত্যাদি প্রবন্ধ, 'ভারত শ্রমজীবী (১৮৭৪) নামক পত্রিকায় প্রকাশিত নানা নিবন্ধ সাম্যচিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। স্মরণ রাখতে হয় আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা (১৭৭৪) এবং ফরাসি বিপ্লব (১৭৮৯-৯১)-এই দুটি ঐতিহাসিক ঘটনা পরোক্ষে সারাবিশ্বেই মানবমুক্তির বার্তা ধ্বনিত করেছিল। উনিশ শতকের বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মধ্যেও সেভাবনার তরঙ্গ পৌঁছেছিল। 'সাম্য' রচনার প্রেক্ষাপটটি গ্রন্থটি আলোচনার ক্ষেত্র এইজন্য স্মরণ করে নিতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদী চিন্তাভাবনার ভিত্তি হল—রুশো, সেন্ট সাইমন, রবার্ট ওয়েন, শার্ল ফ্যুরিয়র, লুই ব্লাঙ্ক—প্রমুখ সাম্যবাদীদের মতবাদ। এছাড়া মিলের মতবাদ এখানে গুরুত্ব পেয়েছে।

১.৪ সাম্য : মূল প্রবন্ধের নিবিড় পাঠ

।। প্রথম পরিচ্ছেদ ।।

মানবসমাজের মধ্যে একটি প্রধান প্রবৃত্তি হল বৈষম্যজ্ঞান। এজন্যই কেউ অভিহিত হন বড়োলোক বলে আবার কেউ আমাদের চোখে ছোটোলোক। এই বড়োলোক এবং ছোটোলোকের প্রভেদ তৈরি হয় কীভাবে? অর্থনৈতিক মানদণ্ডই এই পার্থক্যরেখা তৈরি করে। কিন্তু প্রাবন্ধিক সে-কথা বলেই ক্ষান্ত হলেন না, জানালেন অন্যকথা; একজন বড়োলোক হয় কীভাবে? যদু চুরি করতে জানে না, বঞ্চনা করতে জানে না, অতএব যদু ছোটোলোক। আর রাম চুরি করে, বঞ্চনা করে, অতএব বড়োলোক। আবার যদি রাম নিরীহ ভালো মানুষ আর রামের প্রপিতামহ জুয়াচোর ছিলেন—এরকম হয়, তবুও রাম বড়োলোক। অর্থাৎ অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বড়োলোক হবার উপায় শঠতা, বঞ্চনা।

অর্থনৈতিক মানদণ্ড ছাড়াও আরেকপ্রকার বড়োলোকের কথা বললেন বঙ্কিম। এসেছে 'কন্যাভারগ্রস্ত' গোপাল ঠাকুরের কথা। গোপাল দরিদ্র, মুর্খ, পাপিষ্ঠ, তবুও সে বড়োলোক। কারণ সে জাতিতে ব্রাহ্মণ। অর্থাৎ জাতি বৈষম্যেও ছোটোলোক-বড়োলোক নির্ধারিত হয়।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমের তাই সিদ্ধান্ত—"অতএব সংসার বৈষম্যপরিপূর্ণ।—সকল বিষয়েই বৈষম্য জন্মে।" এই বৈষম্য দু-প্রকারের—প্রকৃত বৈষম্য ও অপ্রকৃত বৈষম্য। যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মের অধীন তাই

প্রকৃত বৈষম্য। আর যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়ম অনুযায়ী নয়, মনুষ্যকৃত বৈষম্য তাই অপ্রকৃত বৈষম্য। এই অপ্রকৃত বৈষম্যই অসাম্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির সে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান।"

বঙ্কিমের মতে পৃথিবীতে তিনজন ব্যক্তি এই অসাম্য দূরীকরণে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনজনের মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম, 'মনুষ্য সকলেই সমান'। এই তিনজন হলেন—বুদ্ধদেব, যিশুখ্রিস্ট এবং রুশো।

শাক্যসিংহ বুদ্ধদেব ভারতবর্ষকে বৈদিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যের পীড়ন থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ভারতবর্ষের বর্ণবৈষম্য তার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ করেছিল। সকল উন্নতির মূল জ্ঞানোন্নতি। বর্ণবৈষম্যের ফলে একমাত্র ব্রাহ্মণরাই ছিলেন একমাত্র জ্ঞান আলোচনার অধিকারী, অথচ ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। ব্রাহ্মণরা লিখলেন সকল কাজই পাপ, আর সকল পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত কঠিন।

এরকম অবস্থায় ভারতবর্ষে শাক্যসিংহের আবির্ভাব নতুন মন্ত্র নিয়ে এল। বঙ্কিমের জবানিতে লেখা যায়—"তখন বিশুদ্ধাত্মা শাক্যসিংহ ..... দিগন্ত প্রভাবিত রবে বলিলেন, 'আমি উদ্ধার করিব। ..... তোমরা সবাই সমান। ব্রাহ্মণ শূদ্র সমান। মনুষ্যে মনুষ্যে সকলেই সমান। সকলেই পাপী, সকলেরই উদ্ধার সদাচরণে। বর্ণবৈষম্য মিথ্যা। যাগযজ্ঞ মিথ্যা। বেদ মিথ্যা, সূত্র মিথ্যা, ঐহিক সুখ মিথ্যা, কে রাজা, কে প্রজা, সব মিথ্যা। ধর্ম্মই সত্য। মিথ্যা ত্যাগ করিয়া সকলেই সত্যধর্ম্ম পালন কর।' বৌদ্ধধর্মে বর্ণবৈষম্য অনেকখানি দূর হয়েছিল। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, শিলাদিত্যের মতো সম্রাটের এই সময়কালেই অভ্যুদয় হয়েছিল। শিল্পবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র, বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। বঙ্কিমের চোখে দ্বিতীয় সাম্যাবতার হলেন যিশুক্রিস্ট। যিশুর জন্য আবির্ভাব ঘটে তখন "রোমক সাম্রাজ্যে চিরদাসত্বজনিত বৈষম্য সাংঘাতিক রোগস্বরূপ প্রবেশ করিয়াছিল।" ভূমিকর্ষণ, গৃহস্থালির কাজ, শিল্পকার্যাদি সমস্তই সাধিত হত দাসদের দ্বারা। পশুর ন্যায় দাস কেনা-বেচা হত। রোমসাম্রাজ্যের তখন দুটি শ্রেণি—প্রভু ও দাস।

একদিকে যেমন মানবসমাজের বৈষম্য, অন্যদিকে ছিল সম্রাটের স্বেচ্ছাচারিতা। ঠিক এইসময় যিশুখ্রিস্ট নিয়ে এলেন মানবতার নতুন বাণী। "তিনি বলিয়াছিলেন, মনুষ্যে মনুষ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ। সকল মনুষ্যই ঈশ্বরসমক্ষে তুল্য। বরং সে পীড়িত, দুঃখী, কাতর, সেই ঈশ্বরের অধিক প্রিয়। এই মহাবাক্যে বড় মানুষের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—প্রভুর গর্ব্ব খর্ব্ব হইল—অজ্ঞাহীন ভিক্ষুকও সম্রাটের অপেক্ষা বড় হইল।"

আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার যে লৌকিক উন্নতি ঘটেছে তার পিছনে রয়েছে অনেক কারণ, কিন্তু প্রধান কারণ খ্রিস্টীয় নীতি এবং গ্রিক সাহিত্য ও দর্শন। তবে খ্রিস্টধর্মে কেবল সুফল ফলেনি, ফলেছিল কুফলও। কালক্রমে ধর্মযাজকদের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইউরোপীয় দেশগুলিতে গুরুতর বৈষম্য দেখা দিয়েছিল। বিশেষত ফ্রান্সে উচ্চশ্রেণি আর নিম্নশ্রেণির বৈষম্য এমন গুরুতর হয়েছিল যে তার ফলে ফরাসি বিপ্লব ঘটেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র জানালেন—"সেই মথিত সাগরের একজন মন্থনকর্ত্তা ছিলেন—তিনিই তৃতীয়বারের সাম্যতত্ত্ব প্রচারকর্ত্তা। তৃতীয় সাম্যাবতার রুশো।"

।। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ।।

অষ্টাদশ শতাব্দির ফ্রান্সের অবস্থা এবং ফরাসি বিপ্লব সম্পর্কে কার্লাইলের অভিমত উপস্থাপিত হয়েছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে। পঞ্চদশ লুইয়ের প্রমোদাসক্তি, উপপত্নীদের পরিতুষ্টির জন্য অর্থব্যয় রাজকোষ শূন্য করে দিয়েছিল। এই অর্থব্যয়ের জন্য প্রজা শোষণ ক্রমশ বেড়েই চলেছিল। তৎকালীন ফ্রান্স রাজ্যের অবস্থা ছিল এই রকম—"একদিকে

রম্যোদ্যান, বনবিহার, নৃত্যগীত, পরস্ত্রীর সহিত প্রণয়, হাস্যপরিহাস, অনন্ত প্রমোদ, চিন্তাশূন্যতা;—আর একদিকে দারিদ্র্য, অনাহার, পীড়া, নিরপরাধে নাবিক দাসত্ব, ফাঁসিকাঠ, প্রাণবধ! পঞ্চদশ লুইর রাজ্যকালে ফ্রান্সদেশে এইরূপ গুরুতর বৈষম্য।"

রুশোর মূলকথা হল সাম্য প্রাকৃতিক নিয়ম। মানুষমাত্রেই নৈসর্গিক সমান এবং সম্পত্তির অধিকারেও। পৃথিবীর ভূমিতে রাজার যে অধিকার, ভিক্ষুকেরও সেই অধিকার। যখন বলবান দুর্বলকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে লাগল, তখনই আরম্ভ হল সমাজ-সংস্থাপন। সেই অপহরণের স্থায়িত্বকরণেরই অপর নাম আইন।

রুশো তাঁর বিখ্যাত 'Le Contrat Social' গ্রন্থে পূর্ববর্তী বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করেন। সম্পত্তির ক্ষেত্রে তিনি প্রথমাধিকারীকে অধিকারী বলে প্রথমে স্বীকার করে নেন, তবে সেক্ষেত্রে কতকগুলি শর্তের কথা বলেন। প্রথম যদি ভূমিটি পূর্বে অধিকৃত না থাকে, দ্বিতীয়ত, অধিকারী যদি কেবল আত্মভরণপোষণের উপযোগী মাত্র ভূমি অধিকার করে, তৃতীয়ত যদি নামমাত্র দখল না নিয়ে কর্ষণাদির দ্বারা দখল নেওয়া হয়। তিনি আরও জানালেন, পাঁচজন ব্যবসাদার যেমন পরস্পরের কতকগুলি নিয়ম বা শর্ত ঠিক করে নিয়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানি খোলে, তেমনি সমাজ, রাজ্য, শাসন মানুষের মঙ্গলার্থ মানুষের দ্বারা সৃষ্ট। এছাড়াও রয়েছে ফুরিরিজম তত্ত্ব। তাঁদের মত হল, ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি থাকতে পারে না—একথা বলা যায় না। উৎপন্ন ধনের মধ্যে প্রথমে কিছু অংশ সমপরিমাণে সকলের মধ্যে বিতরিত হবে। যে শ্রমে অপারগ, সেইজনও তার ভাগ পাবে। তারপর যা অবশিষ্ট থাকবে তা শ্রমকারী, মূলধনাধিকারী এবং কর্মনিপুণদের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে বিভক্ত হবে।

ভূসম্পত্তির উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্নেই বঙ্কিমচন্দ্র জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। মিলের মতে যিনি উপার্জন কর্তা, উপার্জিত সম্পূর্ণ অধিকার। এই সম্পত্তি অপর্যাপ্ত হলেও যাবজ্জীবন ভোগ করার এবং জীবনান্তে যাকে খুশি দিয়ে দেবার অধিকার আছে। কিন্তু তিনি যদি জীবনান্তে অন্যকে ভোগ করার অধিকার না দিয়ে যান তাহলে তাঁর সম্পত্তি একা ভোগ করার অধিকার কারও নেই।

মানবজগতে যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত সেই ব্যবস্থার সংশোধন না করলে কখনও মানবপ্রজাতির প্রকৃত উন্নতি সম্ভব নয়। পৃথিবীর সুখে তথাকথিত বড়োলোক এবং ছোটোলোকের সমান অধিকার। এইজন্যই প্রাবন্ধিক স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যিনি ন্যায়বিরুদ্ধ আইনে পিতৃসম্পত্তি অর্জন করে দোর্দন্ড প্রতাপশালী মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করেছেন, তাঁরও যেন মনে থাকে যে বঙ্গদেশের কৃষক পরাণ মন্ডল তাঁর সমকক্ষ, তাঁর ভাই। কারণ যে সম্পত্তি তিনি একা ভোগ করছেন পরাণ মন্ডলও তাঁর ন্যায়সঙ্গাত অধিকারী। এই দিক দিয়ে দেখার ফলে তার ফল হল গুরুতর।—

—"এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে তুমি আমার জমী চষিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব, এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যে দিন আমার ভূমি কর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য্য ন্যায়সঙ্গাত হইল। তেমনি যদি রাজাপ্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, "তুমি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গাল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য্য আমাদের মঙ্গাল করা, আমাদের কার্য্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞাপালন। তুমি এখন আর আমাদের মঙ্গাল কর না, অতএব আমারও তোমাকে কর দিব না বা তোমার আজ্ঞাপালন করিব না।" বঙ্কিমের মতে 'Le Contrat Social' গ্রন্থের চরম ফল হল ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতি এবং প্রাণদন্ড।

রুশো যে "ভূমি-সাধারণের" কথা বলে মহাবৃক্ষের বীজ রোপণ করেছিলেন তাতে নিত্য নতুন ফল ফলতে আরম্ভ করে। "কম্যুনিজম" সেই বৃক্ষের ফল। "ইণ্টারন্যাশনল" সেই বৃক্ষের ফল।"

ভূমি এবং মূলধন যার দ্বারা ধনের উৎপত্তি, তা সামাজিক সর্বলোকের সম্পত্তি হোক। যা উৎপন্ন হবে, তা সকলে সমানভাবে বণ্টন করে নেবে। সকলের সমান পরিশ্রম, সকলের সমান ধনের অধিকার—এটিই কম্যুইনিজ্‌ম্‌-এর মূল কথা। তবে কম্যুইনিস্টদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রমানুসারে ধনের ভাগ কর্তব্য বলে মনে করেন, যেমন লুই ব্লাং। এই মতকে বলা হয় সেন্টাসাইমনিজম্‌। যে যেমন পরিশ্রমের উপযুক্ত, ও যে কাজের উপযুক্ত, সে সেই রকম পরিশ্রম করবে এবং সেরকম কাজে নিযুক্ত হবে।

।। তৃতীয় পরিচ্ছেদ ।।

বঙ্গদেশের কৃষকের প্রতিনিধি স্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র পরাণ মণ্ডল চরিত্রটিকে সৃষ্টি করেছেন এবং যার মধ্য দিয়ে বঙ্গদেশের কৃষকদের দুদর্শার কথা বর্ণনা করেছেন।

যে বসুন্ধরা কারও একার সম্পত্তি নয়, কিন্তু তাকেই ভূমধ্যিকারীরা বণ্টন করে নেওয়ারফলে যে বৈষম্য দেখা দিয়েছে তাই এখানে বর্ণিত হয়েছে।

জমিদারবাবু যখন সাতমহল পুরীর মধ্যে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তি রূপ প্রত্যক্ষ করছেন, তখন পরাণ মণ্ডল পুত্রসঙ্গে দ্বিপ্রহর রৌদ্রে, খালি মাথায়, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দুটি অস্থিচর্মসার বলদে এবং ভোঁতা হালে জমিদারের ভোগের আয়োজন চালাচ্ছে। এই একটি ছবির মধ্য দিয়েই সামাজিক বৈষম্য, বঙ্গদেশের কৃষক এবং কৃষিব্যবস্থার প্রকৃত অবস্থাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন লেখক।

পৌষ মাসে ধান কেটেই কৃষককে পৌষের কিস্তি খাজনা মেটাতে হয়। প্রত্যেকেই পুরো খাজনা মেটাতে পারে না। কৃষক সারাবছরের খাজনা মেটাতে হাজির হয় চৈত্র মাসে। পরাণ মণ্ডলের পৌষের কিস্তির পাঁচ টাকার এক টাকা বাকি, আর চৈত্রের কিস্তি তিন টাকা, মোট চার টাকা নিয়ে হাজির। কিন্তু সোমস্তার কঠিন হিসাব, পৌষের এক টাকা বাকির জায়গায় তিন টাকা বাকির কথা লেখা থাকে খাতায়। পরাণ মণ্ডলকে মেনে নিতে হয়। তারপর আবার গোমস্তার হিসাবানা, এছাড়া নামের গোমস্তা, তহশিলদার, মুহুরি, পাইক, সকলকেই পাটণী দিতে হয়।

আষাঢ় মাস নববর্ষের শুভ পুণ্যাহ। শুভ পুণ্যাহে খাজনা দিতে হয়, তার সঙ্গে আবার জমিদারকে নজরানা দিতে হয়। জমিদাররা অনেক শরিক হলে নজরানাও পৃথক পৃথক। শুধু জমিদার নয়, নায়েব, নায়েবের পর গোমস্তা সকলেই নজরানা নেয়।

সমস্ত কিছু মিটিয়ে চাষি হয়ে পড়ে নিঃস্ব। ঘরে খাবার জোগাড় নেই, এদিকে চাষের সময় উপস্থিত। তখন পরাণ মণ্ডলদের ভরসা মহাজন। "পরাণ মহাজনের কাছে গেল। দেড়া সুদে ধান লইয়া আসিল। আবার আগামী বৎসর তারা সুদ সমেত শুধিয়া নিঃস্ব হইবে। চাষা চিরকাল ধার করিয়া খায়, চিরকাল দেড়া সুদ দেয়।" কোনও কোনও ক্ষেত্রে জমিদার নিজেই মহাজন। মহল জমিদার স্বয়ং প্রজার অর্থাপহরণ করে তাকে নিঃস্ব করেন, আবার তাকেই ধার দিয়ে সুদের টাকা আত্মসাৎ করেন।

খাজনার কিস্তি জমা না দিলে আরেক বিপদ। হয় পাইক, পিয়াদা, না হয় গোমস্তার পীড়ন তাকে সহ্য করতে হয়। কেবল খাজনা বাকি থাকার জন্য নয়, কাছারিতে আটক রাখা, মারপিট করা, জরিমানা করা তাদের জীবনে নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরাণ মণ্ডলেরা খাজনা বাকি রাখলে জমিদার সম্পত্তি ক্রোক করে। আইনের আশ্রয় নিয়েও কোনও সুরাহা হয় না। কারণ 'আদালত এবং বারাঙ্গানার মন্দির তুল্য; অর্থ নাহলে প্রবেশের উপায় নাই।" এদিকে আদালতের সাক্ষীরা জমিদারের প্রজা—ভয়ে তাঁর বলীভূত, আর 'পিয়াদা মহালয় রৌপ্যমন্ত্রের সেই পথবর্ত্তী।' ফলে মামলাতে পরাণের পরাজয় হয়।

কিন্তু বঙ্গাদেশের কৃষকদের এই দুর্দশা কথা জানানোর পরেও দু-একটি কথা জানানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রথমত তিনি জানান সকল জমিদারই অত্যাচারী নন। দ্বিতীয়ত এই সকল অত্যাচার অনেক ক্ষেত্রেই জমিদারের অজ্ঞাতে বা অভিমত বিরুদ্ধে ঘটে। তৃতীয়ত, অনেক জমিদারির প্রজাও ভালো নয়। পীড়ন না করলে প্রজারা খাজনা দেয় না। কিন্তু সেইসঙ্গে এ-কথাও বলেন যে প্রজার উপর আগে অত্যাচার না হয়ে থাকলে, তারা বিরুদ্ধভাব ধারণ করে না।

।। চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।।

বঙ্গাদেশের তথা ভারতবর্ষের কৃষকদের এই দুর্দশা কেন হল সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র চতুর্থ পরিচ্ছেদে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। এই দুর্দশা একদিনে ঘটেনি। যতদিন ভারতবর্ষে সভ্যতার সৃষ্টি প্রায় ততদিন থেকেই ভারতবর্ষের কৃষকদের দুর্দশারও সূত্রপাত।

বঙ্কিচন্দ্র এই দুর্দশার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে বক্‌ল্‌-এর মতের সাহায্য নিয়েছেন। প্রাবন্ধিক জানালেন যে জ্ঞানের উন্নতি না হলে সভ্যতার উন্নতি হয় না। জ্ঞানের উন্নতির জন্য বিদ্যালোচনার প্রয়োজন। আর অনাহারে বিদ্যালোচনা হয় না। সকলেই উদরপোষণের সন্ধানে থাকলে জ্ঞানালোচনার অবকাশ তৈরি হবে না। ফলে সভ্যতার সৃষ্টি লগ্নেই একদল মানুষ তৈরি হয়েছেন যারা ভরণপোষণের জন্য খাদ্য উৎপন্ন করে—এরা শ্রমজীবী। উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ যখন অধিক হয়, নিজের ভরণপোষণের পরও যখন সঞ্চয় হয়, তখনই জ্ঞানের উদয় সম্ভব। কারণ এই অতিরিক্ত উৎপন্ন খাদ্যে শ্রমবিরত ব্যক্তি ভরণপোষণ যোগায় এবং তাঁরা বিদ্যানুশীলন করতে পারেন। অর্থাৎ সভ্যতার প্রাথমিক প্রয়োজন ধনসঞ্চয়। দুটি কারণে একটি দেশে ধনসঞ্চয় হয়ে থাকে। প্রথম কারণ—ভূমির উর্বরতা। ভূমি উর্বর হলে খুব সহজেই বেশি শস্য উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয় কারণ—দেশের উষ্ণতা বা শীতলতা। যে দেশ উষ্ণ সে দেশের লোক স্বল্পাহার আবশ্যক, আর শীতল দেশে অধিক আহার প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ উষ্ণদেশ অবং এর ভূমিও উর্বর। এইজন্য ভারতবর্ষে ধনসঞ্চয় সম্ভব। ধনাধিক্য হেতুই জ্ঞানালোচনাতেও তৎপর হতে পেরেছিল এই দেশ। কিন্তু যে কারণে সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটেছিল দ্রুত, সেই নিয়মেই সাধারণ প্রজাদের দুর্দশা ঘটেছিল।

জনসমাজে ধনসঞ্চয় সমাজকে দ্বিধাবিভক্ত করে দিল। একদল শ্রমোপজীবী, অন্যদল বুদ্ধ্যপজীবী। যারা শ্রম করে না, তারা চিন্তা করে, শিক্ষা পায় এবং সমাজে তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের উৎপন্ন ধন দুভাগে বিভক্ত হয়—এক শ্রমোপজীবীর, অন্যভাগ বুদ্ধ্যপজীবীর। প্রথম ভাগে প্রাপ্তি মজুরির বেতন, দ্বিতীয়ভাগে প্রাপ্তি মুনাফা। শ্রমোপজীবীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেলে, উৎপন্ন ধনের যে অংশটি বেতন সেটিই বিভক্ত হবে। অর্থাৎ শ্রমোপজীবীর সংখ্যাবৃদ্ধি শ্রমোপজীবীর দুর্দশার কারণ।

যদি লোকসংখ্যাবৃদ্ধি না হয়ে ধনবৃদ্ধি হয়, তাহলে শ্রমোপজীবীর উন্নতি হয়। কিন্তু ভারতবর্ষে ধনবৃদ্ধি অপেক্ষা লোকসংখ্যা বৃদ্ধি অধিক। এই লোকসংখ্যাবৃদ্ধি স্বাভাবিক নিয়ম। সমস্যাটি থেকে উদ্ধারের দুটি উপায়,—প্রথমত দেশীয় লোকদের কিছু অংশে দেশান্তরে গমন। দ্বিতীয়ত বিবাহপ্রবৃত্তির দমন। কিন্তু ভারতবর্ষে এই দুটির কোনওটিই অবলম্বিত হয়নি বলেন বঙ্কিমচন্দ্র।

শ্রমোপজীবীদের দুর্দশার পরিচয় দিয়ে তার তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এরপর সূত্রাকারে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

এক।। শ্রমোপজীবীদের অবনতির কারণ তিনটি—দারিদ্র, মূর্খতা, দাসত্ব। বেতনের স্বল্পতা সৃষ্টি করেছে দারিদ্র। বেতন অল্প হলেও পরিশ্রম অধিক, অবকাশের অভাবে বিদ্যাচর্চার অভাব। এর ফল মূর্খতা। বুদ্ধ্যপজীবীদের অত্যাচার ও প্রভুত্ববৃদ্ধির ফলে এল দাসত্ব।

দুই।। প্রাকৃতিক কারণেও ভারতবর্ষে শ্রমোপজীবীদের অবনতির ধারা অব্যাহত থাকল। মানুষের মনে নিত্য নতুন আকাঙ্ক্ষার জন্ম তাকে সফলতা দেয়। ভারতবর্ষের ভূ-প্রকৃতি তার অনুপযুক্ত। তাপাধিক্যের কারণে এদেশের মানুষ এককালীন অধিক পরিশ্রম করতে পারে না। একদিকে সুখলালসার অভাব অন্যদিকে প্রকৃতির বিরূপতা উদ্যমহীন করে তোলে, যা দুর্দশা ডেকে আনে। আবার "কি ব্রাহ্মণ, কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে ঐহিক সুখ অনাদরণীয়।" এইসকল কারণেই ভারতবর্ষের সামাজিক বৈষম্য ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকল।

তিন।। কেবল শ্রমোপজীবী নয়, শ্রমোপজীবীদের দুর্দশার কারণে সকল শ্রেণির মধ্যেই এই দুর্দশা দেখা গেল।

(ক) বৈশ্য বাণিজ্যব্যবসায়ী। ব্যবসা পরিপূর্ণভাবে উৎপন্ন দ্রব্যের প্রাচুর্যের উপর নির্ভর করে। যে দেশে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সামগ্রী উৎপন্ন না হয় সে দেশে বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব নয়। বাণিজ্যের উন্নতি না হলে 'বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের সৌষ্ঠবের হানি।'

(খ) সাধারণ প্রজা যদি নিস্তেজ হয় এবং রাজাদের নিয়ন্ত্রণ করবার মতো মানসিকতা না থাকে তাহলে রাজপুরুষ অর্থাৎ ক্ষত্রিয়দের উন্নতি হয় না। কেউ যদি প্রতিবাদ না করে তাহলে স্বেচ্ছাচারী হয়ে যায়। আর "স্বেচ্ছাচারী হইলেই আত্মসুখরত, কার্য্যে শিথিল এবং দুষ্ক্রিয়ান্বিত হইতে হয়।"

(গ) প্রজাদের অবনতিতে ক্ষত্রিয়দের প্রথমে প্রভুত্ব বাড়ে,তারপর বিলুপ্ত হয়। ঠিক সে কথা প্রযোজ্য ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও। তিন বর্ণের অনুন্নতিতে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব প্রথমে বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরা শাস্ত্রজাল, ব্যবস্থাজাল বিস্তার করে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রকে জড়িয়ে ফেলতে থাকেন। কিন্তু পরকে ভ্রান্ত করতে চাইলে ক্রমে নিজেরও ভ্রান্তি জন্মে। যা পরকে বিশ্বাস করাতে চাওয়া হয়, তাতে নিজের বিশ্বাস দেখাতে হয়। ফলে নিয়মজালে জড়িত হয়ে ব্রাহ্মণদের মানসক্ষেত্র মরভূমিতে পরিণত হয়।

।। পঞ্চম পরিচ্ছেদ ।।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিঙ্গ-বৈষম্যের কথা আলোচিত হয়েছে। মানুষে মানুষে সমনাধিকার বিশিষ্ট। যেহেতু "স্ত্রীগণও মনুষ্যজাতি, অতএব স্ত্রীগণও পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।" নারী-পুরুষের স্বভাবগত বৈষম্য আছে, অতত্র অধিকারগত বৈষম্য থাকা বিধেয়—এই মতে বিশ্বাসী নন বঙ্কিমচন্দ্র। কারণ তাহলে ইংরেজ ও বাঙালিরও স্বভাবগত বৈষম্য আছে, কিন্তু তাই বলে দুই জাতির অধিকার বৈষম্যকে আমরা সঙ্গত বলতে পারি না। আবার নারী-পুরুষের যে অধিকার বৈষম্য প্রত্যক্ষ করি তা মূলত সামাজিক নিয়মের দোষে, স্বভাবগত বৈষম্যের কারণে নয়।

আমাদের দেশে নারী খাঁচায় বন্দি রাখা পাখির মতো। যে বুলি শেখাবে তা বলবে, খেতে দিলে খাবে, তা নাহলে একাদশী করবে। পতি তাদের কাছে দেবতাস্বরূপ। নারী-পুরুষের এই গুরুতর বৈষম্য দূরীকরণে বর্তমানে কিছু প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ করেছেন। সেইদিকটিকেই এখানে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছেন।—প্রথমত, আমাদের দেশে পুরুষের বিদ্যাশিক্ষা করে, নারীরা থাকে অশিক্ষিত। কিন্তু সাধারণ মানুষের মনোভাব সামান্য হলেও পরিবর্তিত হয়েছে। মেয়েদের লেখাপড়া শেখানো দরকার একথা অনুভব করেছে। কিন্তু মেয়েরা ছেলেদের মতো সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি শিখুক—এরকম মনোভাব নেই। মেয়েদের শিক্ষা সেই কথামালাতেই সমাপ্ত। মেয়েদের শিক্ষাঅর্জনের বাস্তব সঙ্কটও রয়েছে। মেয়েদের জন্য পৃথক স্কুল নেই। আবার ছেলেদের স্কুলেই মেয়েদের পাঠানোর মানসিকতা তৈরি হয়নি। এছাড়া মেয়েরা লেখাপড়া শেখার কাজে ব্যস্ত হলে সন্তান প্রতিপালন, সংসারের কাজ করবে কে? বঙ্কিমচন্দ্র এর মধ্যেই অসাম্যটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন। তিনি জানান—"যাহাকে

গৃহধর্ম্ম বলে, সাম্য থাকিলে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই তাহাতে সমান ভাগ। একজন গৃহকর্ম্ম লইয়া বিদ্যাশিক্ষায় নির্ব্বিঘ্ন হইবে; ইহা স্বভাবসঙ্গত হউক বা না হউক, সাম্যসঙ্গত নহে।"

দ্বিতীয়ত অসাম্যের প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে বিধবাবিবাহকে কেন্দ্র করে। বিধবা বিবাহ ভালো, কি মন্দ—এই প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর হয় বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করছেন না। কিন্তু উচিত-অনুচিত ব্যাপারটিকে সরিয়ে সাম্যনীতির দিকটি বিবেচনার অবকাশ আছে। এ ক্ষেত্রে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য—"কিন্তু মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে, যে যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমন কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে করিতে পারে। সুতরাং পত্নীবিযুক্ত পতি, এবং পতিবিযুক্ত পত্নী ইচ্ছা হইলে পুনঃপরিণয়ে উভয়েই অধিকারী বটে।"

তৃতীয়ত, স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্যের গুরুতর দিক হল স্ত্রীদের গৃহবন্দি করে রাখার প্রবণতা। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক সমস্ত কিছুর অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত। ধর্মরক্ষার্থ নারীদের পিঞ্জরাবদ্ধ আবশ্যক—এরকম মতামতও অনেকে পেশ করে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁরও বিরোধিতা করেন,—

"ধর্ম্মরক্ষার্থ যে স্ত্রীগণকে পিঞ্জরাবদ্ধ রাখা আবশ্যক, হিন্দুমহিলাগণের এরূপ কুৎসা আমরা সহ্য করিতে পারি না। কেবল সংসারে লোকসহবাস করিলেই তাহাদিগের ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে, পুরুষ পাইলেই তাহারা কুলধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার পিছু পিছু জুটিবে, হিন্দু স্ত্রীর ধর্ম্ম এরূপ বস্ত্রাবৃত বারিবৎ নহে।"

চতুর্থত, নারী-পুরুষের বৈষম্যের প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হয়েছে বহুবিবাহের অধিকার নিয়ে। এক্ষেত্রে নারীরাও পুরুষের মতো বহুবিবাহের অধিকারিণী হন এরকম বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত নয়। বরং তিনি মনে করতেন মনুষ্যজাতি মধ্যে কারও বহুবিবাহের অধিকার থাকা উচিত নয়।

এই চারটি ছাড়াও নারী-পুরুষের বৈষম্যের ক্ষেত্রে সম্মত্তির অধিকার বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। পৈতৃক সম্পত্তিতে পুত্রের সম্পূর্ণ অধিকার, অথচ কন্যা সেখানে কেউ নয়। কেউ কেউ বলেন স্ত্রী স্বামীর ধনে স্বামীর মতোই অধিকারিণী, এইজন্য পৈতৃক ধন অধিকারিনী হবার কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন বিধবা কন্যা বিষয়াধিকারিণী হয় না কেন? কিংবা যে কন্যার বিবাহ দরিদ্র ঘরে হয়েছে, সে উত্তরাধিকারিণী হয় না কেন? লক্ষণীয় স্ত্রীকে স্বামী বা পুত্র বা এরকম কোনও পুরুষের আশ্রিতা হয়ে ধনের অধিকারিণী হতে হয়। অন্যদিকে পুরুষ সর্বাধিকারী—স্ত্রীর ধনও তার ধন। বঙ্কিমচন্দ্র বলছেন—"এ বৈষম্য গুরুতর, ন্যায়বিরুদ্ধ এবং নীতিবিরুদ্ধ।"

সম্পত্তির অধিকারের পর এসেছে উপার্জনের প্রসঙ্গ। তথাকথিত নিম্নশ্রেণির নারীরা ছাড়া এসেধে নারীরা উপার্জন করতে পারে না। এর প্রথম কারণ—দেশি সমাজের রীতি অনুসারে ঘরে বাইরে মেয়েদের বেরুনো নিষেধ। আর বাইরে না বেরুলে উপার্জন অসম্ভব। দ্বিতীয় কারণ হল মেয়েরা সে পরিমাণে শিক্ষিত নয়, যাতে উপার্জন করতে পারে। তৃতীয়ত পুরুষদের চাকরির অভাব, সেখানে নারীদের রোজগারের জায়গা নেই। তবে তিনটি ক্ষেত্রেই এই সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হবার উপায় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে হয়েছে—শিক্ষা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়—"লোকে সুশিক্ষিত হইলে, বিশেষতঃ স্ত্রীগণ সুশিক্ষিতা হইলে, তাহারা অনায়াসেই গৃহমধ্যে গুপ্ত থাকার পদ্ধতি অতিক্রম করিতে পারিবে। শিক্ষা থাকিলেই, অর্থোপার্জনে নারীগণের ক্ষমতা জন্মিবে। এবং এ দেশী স্ত্রীপুরুষ সকল প্রকার বিদ্যার সুশিক্ষিত হইলে, বিদেশী ব্যবসায়ী, বিদেশী শিল্পী বা বিদেশী বণিক, তাহাদিগের অন্ন কাড়িয়া লইতে পারিবে না। শিক্ষাই সকল প্রকাল সামাজিক অমঙ্গাল নিবারণের উপায়।"

।। উপসংহার ।।

উপসংহারে এসেছে জাতিগত বৈষম্যের কথা। অবশ্য এই জাতি কথাটির অর্থ বর্ণ নয়। এখানে জাতিগত বৈষম্য মানে বলতে চাওয়া হয়েছে জয়ী ও বিজিতের মধ্যে সম্পর্ক। রাজা এবং প্রজার মধ্যে যে অধিকারগত বৈষম্য সে-কথাকেই বোঝাতে চাওয়া হয়েছে। কিন্তু বিশদভাবে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়নি।

বুদ্ধি, মানসিক শক্তি, শিক্ষা, বল প্রভৃতির তারতম্যে অবস্থার তারতম্য ঘটে এ কথা স্বীকার করেন প্রাবন্ধিক। তবে অধিকারের সাম্য থাকা আবশ্যিক এই জন্যও প্রবন্ধটির শেষ বাক্য—"সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি।"

১.৫ বিষয়বস্তুর পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ

☐ প্রথম পরিচ্ছেদ

'সংসার বৈষম্য পরিপূর্ণ', 'পরস্পর বৈষম্য জ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্য্যের একটি প্রধান প্রকৃতিমূল' এই দুই উপপাদ্য থেকে বৈষম্যের শ্রেণিবিভাগ করেছেন, (১) প্রাকৃতিক বৈষম্য (২) অপ্রাকৃতিক বৈষম্য;—অপ্রাকৃতিক বৈষম্যকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেন, সামাজিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য। 'সমাজের উন্নতিরোধ ও অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ,—অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে স্পষ্ট বীতরাগ জানিয়ে বলেছেন, বৈষম্যের ফলেই বিপ্লব সংঘটিত হয়, প্রসঙ্গত ফরাসী বিপ্লবের কথা বলেছেন। বৈষম্যের পরিবর্তে সমাজে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনতে সশস্ত্র বলের থেকে 'বাক্যবলই' যে কাঙ্ক্ষিত,—এ দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা বলে বুদ্ধ, যিশু, রুশোর ঐতিহাসিক অবদানের আলোচনা করেছেন, তাঁর মতে পৃথিবীতে এই তিনজনই প্রকৃত 'সাম্যাবতার'।

☐ দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

ফরাসী বিপ্লবের অব্যবহিত পূর্বের ফ্রান্সের বৈষম্য পরিপূর্ণ অর্থনৈতিক সামাজিক জীবনের ভয়াবহ ছবি এঁকেছেন এবং সেই তথাকথিত বৈষম্যের স্থলে সাম্য সংস্থাপিত করতে রুশো যে কি ভূমিকা নিয়েছিলেন, তারই মূল্যায়ন করেছেন, বিশেষত 'সামাজিক চুক্তি মতবাদ'-এর,—"তিনি মহিমাময় লোকহিতকর নৈতিক সত্যের সহিত অনিষ্টকারক মিথ্যা মিশাইয়া, সেই মিশ্র পদার্থকে আপনার অদ্ভুত বাগিন্দ্রজালের গুণে লোকবিমোহিনী শক্তি দিয়া, ফরাসীদিগের হৃদয়াধিকারে প্রেরণা করিয়াছিলেন।..... সকল ফরাসী তাঁহার মানস শিষ্য হইল। তাহারা সেই শিক্ষার গুণে ফরাসী বিপ্লব উপস্থিত করিল।" আবার, "ভূমিসাধারণের—এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্যনূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম' সেই বৃক্ষের ফল। "ইন্টারন্যাশনল' সেই বৃক্ষের ফল।" এরপরেই তিনি সমকালীন পশ্চিম ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারাগুলির অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়েছেন। সারিবদ্ধভাবে এনেছেন সাইমন-কুরিয়র-ওয়েনের সঙ্গে প্রুঁধো এবং ব্ল্যাঙ্ককে; প্রুঁধোর 'The Philosophy of poverty'-র (1847) লেখেন, তখন থেকেই সমাজতন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর চিড়-রেখাটা স্পষ্ট কাটলে রূপ নেয়, আর ব্ল্যাঙ্ক ১৮৭১-এর প্যারী কমিউনের অন্যতম নেতা ও বিধায়ক (ভোটে ভিক্টরহুগোকে পরাজিত করেছিলেন) হওয়া সত্ত্বেও কালের বিচারে সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের তিনি ক্ষতিই করেছিলেন,—যদিও রাজনৈতিক এসব ঘটনাবলী বঙ্কিমচন্দ্রের জানার কথা নয়, সেদিন কলকাতার বুকে বসে জানা সম্ভবই ছিল না, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র 'The Spectator', 'The Westminister Review', 'Black Wood's Magazine' প্রভৃতি বিলিতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। আসলে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবাহটিকে দেখেছিলেন তাত্ত্বিক দিক থেকেই,—'Letters on England' (1866), 'Observation on Economic, Political and Social life in England (1867) গ্রন্থদ্বয়ে ইংল্যান্ডের উনিশ শতকের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশকের অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির উদ্‌ঘাটন করে জন অভ্যুত্থানের যে স্বপ্ন উদ্ভিন্ন করে তুলেছিলেন, তার ভিত্তিতে সেদিনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্ল্যাঙ্ককে কী ভাবেই বা চিহ্নিত করা যেতে পারতো? 'Principles of political economy' (1848), 'On

Liberty' (1859), 'On the Subjection of Women' (1869) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা জন স্টুয়ার্ট মিলকেও (১৮০৬-১৮৭৩) 'সাম্যতত্ত্বের উদ্‌গাতা' বলে অভিহিত করে এক্ষেত্রে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সাম্য আন্দোলন বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন, মানুষে মানুষে ভেদ অসমতা দূরীকরণের সমকালীন প্রয়াসগুলিকেই। পরিদৃশ্যগত ভেদাভেদগুলি কতক দূর করে, কতক সামঞ্জস্যের মধ্যে এনে 'পূর্বতন কুব্যবস্থার সংশোধন' করে 'সুব্যবস্থার প্রবর্তনই তো ছিল উনিশ শতকী বুর্জোয়া মানবতাবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার অভীষ্ট,—যার যাত্রা শুরু হয়েছিলো ইংলন্ডে, Reform Bill (1832), Emancipation of Slaves (1833), System of National Education (1834) কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে ক্রমশ যা পরিপূর্ণ তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি পায় স্টুয়ার্ট মিলের নেতৃত্বে,—প্রাসঙ্গিক ভাবেই তাই বঙ্কিমচন্দ্র মিলকে উদ্ধৃত করেছেন।

□ তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধন, বিশেষ করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের আশু যে সংস্কার দরকার, এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় তিনি বাংলার জমিদার ও কৃষক সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের উপস্থাপনা করেছেন। জমিদারী ব্যবস্থার জন্য উপস্বত্বভোগী নানান শ্রেণির উদ্ভব হয়েছে—জমিদার-সরকার-আমলা এবং এইসব উপস্বত্বভোগীর ধারাবাহিক নিয়ত নতুন অত্যাচারে শোষণে বাংলার কৃষক, মোট জনসংখ্যার যারা 'নিরানব্বই' ভাগ, তারা যে সহ্যের শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে,—তারই হুঁশিয়ারী দিয়েছেন। তাই 'জমীদার সম্প্রদায়ের প্রতি বক্তব্য' 'দুর্বৃত্ত জমীদার'দের 'দুর্বৃত্তি' ত্যাগ করান; দৃঢ়মূল বিশ্বাস, 'সকল জমীদার অত্যাচারী নহেন, জমীদারদিগের দ্বারা অনেক সৎকার্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।'

□ চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেশের জনসংখ্যার যে 'নিরানব্বই ভাগ' কৃষক,—তিনি কৃষকদের সামাজিক দুরবস্থা ও অর্থনৈতিক দুর্গতির উৎস সন্ধান করেছেন। সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'সমাজ শ্রমোপজীবী' ও 'বুদ্ধ্যপজীবী' দুই শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে,—তত্ত্বের অবতারণা করে দেখিয়েছেন 'লোকসংখ্যাবৃদ্ধি শ্রমাপজীবীদের মহৎ অনিষ্টের কারণ', এ ছাড়াও যদিও আছে তাদের নিজস্ব জীবনদর্শন, "ঐহিক সুখ সম্পর্কে নিস্পৃহতা,—কি ব্রাহ্মণ—কি বৌদ্ধ, কি স্মার্ত, কি দার্শনিক, সকলেই প্রাণপণে ভারতবাসীদিগকে শিখাইয়াছেন যে, ঐহিক সুখ অনাদরণীয়।" ইউরোপেও ধর্মযাজকগণ একসময় এই তত্ত্বই প্রচার করেছিলেন, কিন্তু রেনেসাঁস আন্দোলন বিশেষকরে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই নানান কার্যকারণে সেই জীবনদৃষ্টি লোপ পেয়ে যায়, ঐহিক জীবন সম্পর্কে নতুন চিন্তা-তৎপরতা আসে এবং তারই সূত্রে আসে আধুনিক সভ্যতা,—যে সভ্যতা ভোগ্যপণ্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে, 'সর্বদা নূতন নূতন সুখের আকাঙ্ক্ষা'র জন্ম দেয়,—ইংরেজদের সংস্পর্শে এসে সেই সভ্যতারই মুখোমুখি হয় ভারত, ফলে ধনলিপ্সা, ধনসঞ্চয়ের প্রবণতা বাড়ে,—'সমাজ উৎকট বৈষম্যাবস্থায় পতিত' হয়,—'অধস্তন শ্রেণী, হয়ে ওঠে 'শ্রমোপজীবী'। বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্বাস, সমাজ পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্য দিয়েই অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে," যেমন এক ভাণ্ড দুগ্ধে এক বিন্দু অম্ল পড়িলে, সকল দুগ্ধ দধি হয়, তেমনি সমাজের এক অধঃশ্রেণীর দুর্দশায় সকল শ্রেণীরই দুর্দশা জন্মে।" সিদ্ধান্তে এসেছেন, ভারতীয় জীবনের এই অনিষ্টকারক বৈষম্যবিশেষেই ভারতীয় জীবন দুর্দশাগ্রস্ত,—ইউরোপ ষোড়শ শতাব্দী থেকে এই বৈষম্য দূরীকরণের জন্যে নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়েই বর্তমানে সুখ-সমৃদ্ধি পেয়েছে, হয়েছে সভ্য।

□ পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ভারতীয় জনজীবনের পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সম্পর্ক, সমাজে নারীর অধঃস্থ ভূমিকা নিয়ে সবিস্তারে

আলোচনা করেছেন। সমাজ যেমন এগিয়ে চলে সমতা-সামঞ্জস্যে, সংসারও তেমন এগিয়ে চলতে পারে পুরুষ-নারীর সমানাধিকারের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় জনজীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাই তাঁর প্রস্তাব,—

(ক) স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন।

(খ) পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার।

(গ) উপার্জনের অধিকার।

(ঘ) বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার।

এ বিষয়ে তাঁর মূলনীতি 'যাহাতে অন্যের অনিষ্ট নাই, এমত কার্যমাত্রই প্রবৃত্তি অনুসারে' করবার অধিকার, পুরুষ-নারী নির্বিশেষে আছে। পুরুষ শাসিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাই তাঁর ভর্ৎসনা,—"তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার সুতরাং পোয়াবারো। তোমার বাহুবল আছে, সুতরাং তুমি এ দৌরাত্ম্য করিতে পার। কিন্তু জানিয়া রাখ , এ অতিশয় অন্যায়, গুরুতর এবং ধর্মবিরুদ্ধে বৈষম্য।..... স্ত্রীগণকে গৃহমধ্যে বন্য পশুর ন্যায় বদ্ধ রাখার অপেক্ষা নিষ্ঠুর, জঘন্য, অধর্মপ্রসূত বৈষম্য আর কিছুই নাই। আমরা (পুরুষ) শতকের ন্যায় স্বর্গমর্ত্য বিচরণ করিব, কিন্তু ইহারা দেড়কাঠা ভূমির মধ্যে পিঞ্জরে রক্ষিতার ন্যায় বদ্ধ থাকিবে। পৃথিবীর আনন্দ, ভোগ, শিক্ষা, কৌতুক, যাহা কিছু জগতে ভাল আছে, তাহার অধিকাংশে বঞ্চিত থাকিবে! কেন?"

১.৬ বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যভাবনার মূল কথা

ইউরোপে ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে শিল্পবিপ্লব ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় বুর্জোয়া উৎপাদনী সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবীদের জীবন-পরিস্থিতি রুক্ষকঠিন হয়ে উঠতে থাকে; পুঁজির প্রভুত্বের সঙ্গে সঙ্গে নেমে আসে নিষ্ঠুর শোষণপীড়ন, অন্যদিকে বর্ধিত পরাক্রম নিয়ে উত্তাল হয়ে উঠতে থাকে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতিরোধ আন্দোলন, লিঁয়োতে অভ্যুত্থান, চার্টিস্ট ধর্মঘট, সাইলেশিয়ায় তাঁতিদের হাঙ্গামা,—একেরপর এক ঢেউগুলি ঝাঁপিয়েই পড়তে থাকে। সংস্কারমূলক আইনগুলির দয়াদাক্ষিণ্য পেয়েও তাদের জীবন কশাইখানার শূকরদের থেকে বৈশি উন্নত হতে পারে না? বড় বড় শহরগুলিতে শুধু রুটির জন্যে দাঙ্গা হয়ে ওঠে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা; শ্রমিকশ্রেণী নিজস্ব অবস্থান, নিজস্ব কৃত্যাকৃত্যগুলি বুঝে নেবার জন্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সেন্ট সাইমন-কুরিয়র-ওয়েনের মতবাদগুলি এই সময়-বৃত্তেই আন্দোলিত-আলোড়িত হয়ে চলে,—শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে নানান প্রশ্ন জাগায়, ক্ষোভ জাগায়,—উত্তরণের পথানুসন্ধানে প্রবৃত্ত করে তোলে; একের সঙ্গে অন্যের মতপার্থক্য থাকলেও এঁরা (দার্শনিকেরা) সমকালীন বস্তুভিত্তিক জিজ্ঞাসাগুলি থেকে রীতিমত এক মীমাংসায় পৌঁছতে চান, দুঃখ-দারিদ্র্য-দুরবস্থার মধ্যে পতিত শ্রমিকশ্রেণীকে দেখতে পান, বিত্তবান মালিকশ্রেণীকে চিনতে পারেন, ব্যক্তিগত মুনাফা-মজুরি-শ্রম সম্পর্কিত ধারণাগুলিও তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শ্রমিকশ্রেণীকে নতুন সমাজের স্রষ্টা হিসেবে দেখে বৈপ্লবিক সংগ্রামের প্রত্যয় ঘোষণা না করতে পারলেও সমাজের সবচেয়ে সংখ্যাবহুল ও সবচেয়ে দরিদ্রশ্রেণীর অবস্থা উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে পুঁজিবাদের বিকল্প সন্ধানের চেষ্টাও করে চলেন। রাজনীতির ভাষায় এঁরাই ইউটোপিয়ান সমাজতান্ত্রিক। এঙ্গেলস এঁদের সম্পর্কেই শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেছেন, "জার্মান তাত্ত্বিক সমাজতন্ত্র কখনো ভুলবে না যে, তা দাঁড়িয়ে আছে তিনজন মনীষী সাঁ সিমো, কুরিয়ের আর ওয়েনের স্কন্ধে, তাঁদের মতবাদের সমস্ত উৎকল্পনা ও সমস্ত ইউটোপিয়া সত্ত্বেও যাঁরা সর্বকালের মহত্তম চিন্তানায়কদের অন্তর্ভুক্ত, যাঁরা এমন সব সত্যের প্রতিভাদীপ্ত পূর্বানুমান করেছিলেন, যার সঠিকতা আমরা এখন দেখাচ্ছি বৈজ্ঞানিক দিক থেকে।"

সিদ্ধান্ত নেয়াই যায় সেন্ট সাইমন-কুরিয়র-ওয়েন-প্রুঁধোকে এঙ্গেলস-লেনিন যেভাবে দেখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের

সেভাবে দেখার প্রশ্নই ওঠেনা,—ভারতবর্ষের ত্রিসীমানার মধ্যে তখন শিল্পের দূরশ্রুত পদধ্বনিও শোনা যায়নি, শ্রমিক শ্রেণিরও জন্ম হয়নি,—তবুও বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের সন্ধান রেখেছেন, নিজেদের সমাজের অধস্তন শ্রেণির দুঃখ কষ্টের প্রাসঙ্গিকতায় এঁদের চিন্তাভাবনা দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন। এ বিষয়ে তাঁর সর্বাপেক্ষা স্পর্শকাতর জায়গা,—'অনাহারে মরিয়া যাইবার জন্য এ পৃথিবীতে কেহ আইসে নাই।' এই ক্ষুধার প্রশ্নে বেঁচে থাকার প্রশ্নে শ্রমিক কৃষকে তিনি কোন পার্থক্যই দেখতে পান নি। তাঁর এই স্পর্শকাতর জায়গাটি যাঁরাই ছুঁতে পেরেছিলেন, তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন সমাজতান্ত্রিক, বুদ্ধ-যিশু-রুশো-প্রুঁধো-মিল নির্বিচারে সবাই।

যদিও জন স্ট্যুয়ার্ট মিল সম্পর্কে তাঁর বিশেষ দুর্বলতা দেখা গেছে এই প্রবন্ধে। যে উপযোগিতাবাদের ভিত্তিতে মানুষের নৈতিক লক্ষ্য অর্জনই জীবনের চরমতম কথা বলে বেনথাম মনে করতেন, সেই বেনথাম পদ্ধতিরই সারভূত রূপ দেখতে পান মিলের মধ্যে; ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশ ও নৈতিকতার উন্নয়ন,—মিলের এই দুটি দিকই তাঁকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছিল,—মিল যেমন ভাবতেন, প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংশোধনের মধ্যে দিয়ে মানবজাতির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্রও তেমন ভাবতেন গুরুতর সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের আধিক্যগুলি অপনোদিত হতে পারে ব্যক্তির সদিচ্ছার মধ্যে দিয়ে, প্রতিদিনের আত্মকর্ষণার মধ্যে দিয়ে নৈতিকতার বোধকে জাগিয়ে তুলে। মিলকে নিজের মত করে বুঝে নিয়েই তাই তিনি সিদ্ধান্তে এসেছেন।

(ক) 'বৈষম্য থাকাই উচিত'।

(খ) সমাজের দ্বিধাবিভক্তি 'মঙ্গালকর'।

তবে দুটির ক্ষেত্রেই আধিক্য যেন না ঘটে,—প্রচলিত ব্যবস্থাদির সংস্কারের মধ্যে দিয়ে 'অতিরিক্ত বৈষম্যে'র ক্ষেত্রটিকে ক্রমশ সঙ্কুচিত করে আনাই কাঙ্ক্ষিত।

বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও ইংরেজী শিক্ষার কল্যাণে বুর্জোয়া মানবিকতার তত্ত্ব আর সেই তত্ত্বের উদ্‌গাতারূপে মিলের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র মিলের দর্শনেই 'সাম্য' এর মীমাংসা খুঁজে পেয়েছেন, মিলই শেষাবধি থেকে গেছেন তাঁর গুরুরূপে, পথনির্দেশকরূপে। 'সাম্য'-এর 'উপসংহার'-এ 'জাতিগত বৈষম্য'-এর উল্লেখ করেও যে আলোচনা থেকে নিরত থেকেছেন, তার কারণ এইখানেই,—আলোচনা উঠলেই 'জেতাবিজেতা'র প্রসঙ্গ এসে যাবে, অবশ্যই ইংরেজশাসিত ভারতবর্ষের কথা আসবে, আসবে মিলের প্রসঙ্গ,—কেন-না মিলই তো সিপাহী বিদ্রোহের পরেও ভারতে কোম্পানীর শাসন থাকার পক্ষে, উপনিবেশগুলিতে শক্তপোক্ত শাসন অব্যাহত রাখার যুক্তিতে বৃটিশ পার্লামেণ্টে জোর সওয়াল করেছিলেন। বৃটিশ ভারতের অবসান হোক বা কোনভাবে বৃটিশ শাসনের প্রতি ভারতীয়রা বিদ্বেষী হয়ে উঠুক, বঙ্কিমচন্দ্র কোনভাবেই চান নি, তা সত্ত্বেও প্রশ্নটিকে আলোচনার স্তরে এনে ঘৃতাহুতি দিতে চান নি,—'জেতাবিজেতা' সম্পর্ক নিয়ে নাড়াচাড়া করলেই অনেক কঠিন সত্য বেরিয়ে আসবে যা প্রকারান্তরে ইংরেজ বিরূপতাকেই জাগিয়ে তুলবে, পরন্তু নিজের ভূমিকাকেও করে তুলতে হবে আরো স্পষ্ট। ইংরেজ শাসনকে মেনে নিয়েও তখন তিনি চা ভেতরে ভেতরে ক্ষতবিক্ষত হয়ে চলেছেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি পররাজ্য আগ্রাসনের প্রশ্নে 'ইহাই এখনকার international law। যদি সভ্য এবং উন্নত হইতে চাও, তবে কাড়িয়া খাইবে' (কমলাকান্তের জোবানবন্দী)।

ভবতোষ দত্ত 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে বলেছেন ''সাম্য প্রবন্ধে আসলে পরের মতের, বিশেষত মিলের মতের ব্যাখ্যা ছাড়া আর কি আছে? আর যা আছে, তা তিনি 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।'' কেউ কেউ আরও বলেছেন, এই মিলের প্রভাব তাঁর শেষজীবনে তেমন ছিল না, এবং বিশেষত ব্যক্তিত্ববাদী বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তির সম্যক্ অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে মনুষ্যত্বের শীর্ষবিন্দুতে উপনীত হওয়া যাবে, বিশ্বাস করেই

বাইরের থেকে আরোপিত সাম্যতত্ত্বে আর বিশ্বাস করেন নি, একান্ত ভারতীয় হয়ে গীতার মধ্যে দিয়েই সেই কর্মযোগের সন্ধান পেয়েছেন, তাই সাম্যকে পরিত্যাগ করেছেন।

বঙ্কিম সম্পর্কিত এই ভারতীয়ত্বের তত্ত্ব সম্ভবত ঠিক নয়। অনুশীলন তত্ত্বে, ধর্মতত্ত্বে তিনি যে মনুষ্যত্বের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, তাও তো মিলেরই প্রতিধ্বনি। মিলই তো 'Utilitarianism' গ্রন্থে বলেছেন, সামঞ্জস্যের অভাবেই দুঃখ আসে, অনুশীলনের মধ্যে দিয়েই সেই দুঃখ অতিক্রম করা যায়, মানুষের সব দুঃখই দূর করা সম্ভব। সমাজের সুষ্ঠু বিধানে, ব্যক্তির শুভবুদ্ধিতে সবই করা যায়,—শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষার সম্যক্ অনুশীলনই মানুষের পূর্ণতালাভের একমাত্র পথ; বঙ্কিমের অনুশীলন তত্ত্বে এর থেকে বেশি আর কি আছে? বঙ্কিম-মনীষার বিচারে পাশ্চাত্য ও ভারতীয়ত্বের প্রাচীর খাড়া করা তাই যায়না। 'কৃষ্ণচরিত্র'-এর ব্যাখ্যানে কতটুকু গীতা আছে, আর কতটুকুই বা সিলির 'Ecco Homo'র যীশুখৃষ্টের আধুনিক জীবনভাষ্যে আছে তা অনুসন্ধান করে লাভ কী। বঙ্কিমচন্দ্র জীবন সত্যকেই ধরতে চেয়েছেন,—যে সত্য জীবন্ত, বিকাশমান;—অতীত বা বর্তমান, দেশী বা বিদেশী—কোন কিছুতেই যার বীতস্পৃহা নেই।

'সাম্য'-এ এই জীবনের সন্ধানেই দেশীবিদেশী জ্ঞানবিজ্ঞানের পুঁজি আর বাস্তব অভিজ্ঞতার জগৎ তোলপাড় করে তুলেছেন কিন্তু শুরুতেই এমন কতকগুলি স্থিরীকৃত প্রত্যয় ও বিভ্রান্তিকর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন, যেখান থেকে নিষ্ক্রমণের পথ আর পান নি। যে বুদ্ধিজীবী শ্রেণি সম্পর্কে তিনি কখনই শ্রদ্ধাশীল নন, কদাপি আস্থা রাখতে পারেন নি, যখন যেখানে পেরেছেন,—সে 'কমলাকান্ত'-তেই হোক বা 'লোকরহস্য'-তেই হোক,—সর্বত্রই শেষে বিদ্রূপে ভর্ৎসনায় তাদের অন্তঃসারশূন্যতাকে বিস্ফারিত করে দিয়েছেন, অথচ এখানে সেই বুদ্ধ্যপজীবীদের সবচেয়ে জটিল-কঠিন দায়িত্বটি পালন করতে দিয়েছেন,—ইতিহাসচর্চার মধ্যে দিয়ে সিদ্ধান্তে এসেছেন,—এই 'বুদ্ধ্যপজীবী' শ্রেণীই চিন্তা-শিক্ষা-বুদ্ধি দিয়ে সভ্যতাকে ক্রমাগত উন্নত করে চলে।—বর্তমানের 'বৈষম্যের পরিবর্তে সাম্য সংস্থাপিত করতে এরাই অগ্রণী ভূমিকা নেবে। অথচ যে 'বুদ্ধ্যপজীবী'র স্থানীয় প্রতিনিধি 'কেরানী, মাষ্টার, ব্রাহ্ম্ন, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা।' যারা কি-না বঙ্কিমের শুধুই হাসি-ঠাট্টা-পরিহাসেরই লক্ষ্যবস্তু।

'সাম্য'-এর এইসব প্রকল্পিত-প্রত্যয় (hypothesis) ও সিদ্ধান্তগুলির বিভ্রান্তি ও স্ববিরোধিতা পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কাছেই পরিষ্কার হয়ে উঠেছিল, ম্যাথু আর্নল্ড কথিত ভালো প্রবন্ধের যা গুণ 'precision, reason, and balance'—প্রায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধে তিনি যা রক্ষা করে গেছেন, এক্ষেত্রে তারই ব্যত্যয় দেখেছেন, কিন্তু শুধু এই কারণেই যে, 'সাম্য'-এর পুনর্মুদ্রণে সম্মত হননি তা নয়; —তাঁর সামগ্রিক জীবন অন্বেষাই তখন সমষ্টির পথ ছেড়ে ব্যষ্টির পথ ধরেছে, ব্যক্তির পুর্ণতা অর্জনই হয়ে উঠেছে তাঁর জীবনের ধ্রুব। ব্যক্তির মঙ্গল ব্যক্তিকেই করতে হবে, বাইরে থেকে কেউ করে দেবে না,—সভ্যতার ইতিহাসই তো ক্রমোত্তরণের ইতিহাস,—ব্যক্তি তো তারই একক, ব্যক্তিকে অনিবার্যভাবেই সে-ই পূর্ণমান অর্জন করতে হবে;—নতুন করে সেই জীবনের প্রকল্প রচনা করার জন্যে দেশীবিদেশী গ্রন্থাদির পঠনপাঠনে অভিনিবিষ্ট হয়ে ওঠেন,—গীতা উপনিষদ সীলি কার্লাইল মিলের সংশ্লেষে (Synthesis) প্রস্তুত করেন তাঁর অনুশীলন ধর্ম, (doctrine of culture)—যা মানবেন্দ্রনাথ রায়ের মানবতাবাদের পূর্বাভাস। স্বাভাবিকভাবেই তখন আর বস্তুবাদী সমাজবীক্ষণে উৎসাহ রাখতে পারেন না, 'সাম্য'-এর তত্ত্বাংশটি প্রত্যাহার করে নেন।